MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
DEPT. OF BENGALI (UG)
ASSIGNMENT

Topics: ① বাংলা কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের অবদান লেখো।
② ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য সাহিত্যের রঙ্গলালের ভূমিকা লেখো।
③ বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের অবদান আলোচনা করো।

Full Name: JAYASHRI MAJI
Roll No: 33
Class: B.A. (Hons.)
Sem: III
Academic year: 2023-24
Date of Submission: - 30/11/23

Jayashri Maji
Students Signature

Bamuk
14.12.2023
Professor Signature

Q. বাংলা কাব্যের ধারায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান নির্ণয় করো।

=> মধুসূদনের পরেই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর গীতিকবিতা বলিতে ঊনিশ শতকের বাঙালি রাজনৈতিক চেতনা প্রথম সাবলম্বী হতে পেয়েছে। বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে বাঙালি অন্তত সচেতন হতে পেয়েছে। লক্ষণীয় বাঙালির অন্তরে স্বদেশ প্রেমের প্রথম উদ্বোধন ঘটেছিল ইংরেজি শিক্ষা ও প্রতীচ্য বিপ্লবাদর্শের অনুসরণে, কিন্তু ইংরেজি শাসকদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি নাগরিকদের এই প্রাথমিক আতি-বিশ্বাস লুপ্ত হতে দেরি হয়নি। সেদিনকার যৌবনতপ্ত গীতি কবিতার আকর চিত্তের সর্বাধিক্যকে হেমচন্দ্র অসংখ্য গীতি কবিতার স্মৃতি দিয়েছিলেন। এখানেই কবি হিসেবে হেমচন্দ্রের নিজস্বতা।

হেমচন্দ্রের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ গুলি হলো - 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২), খণ্ডকবিতার সংকলন 'কবিতাবলী' (প্রথম ১৮৭০, দ্বিতীয় (১৮৮০), 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮), বৃত্রসংহার (১ম ভাগ - ১৮৭৫/২য় ভাগ ১৮৭৭), 'নাকে খত' নামে কাব্য (১৮৮৫) এছাড়া অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে শেক্সপিয়রের Tempast অবলম্বনে 'নলিনীবসন্ত' (১৮৭০) ও; Romio Jhliet অবলম্বনে 'রোমিও জুলিয়েত' (১৮৯৫) রচনা করেন।

হেমচন্দ্রের কাব্যকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(i) হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যে ঊনিশশতকের হিন্দুসমাজের জাতীয়তার আদর্শ প্রয়োগও প্রচার করেছিলেন।
(ii) ঊনিশ শতকীয় হিন্দুধর্ম - বিশ্বাস ও আচারনিষ্ঠাকে তাঁর কাব্যে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন।
(iii) সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।
(iv) কবিতার নাম আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন।
তাঁর কাব্য-কবিতায় ভাষা সহজ ও বেগবান ছিল।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —
"নানা ধরনের কাব্য, লীরিক কবিতা, ব্যঙ্গরসের কবিতা, নাটকানুবাদ, কবিতানুবাদ প্রভৃতির দ্বারা হেমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে স্মরনীয় হয়ে আছেন। মহাকবির গৌরবের কিঞ্চিত ভাগ যদি মধুসূদন ছাড়া আর কাউকে দিতে হয়, তবে হেমচন্দ্র সে গৌরব দাবী রাখতে পারেন।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ন ইতিহাস / ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী'। জনৈক বন্ধুর আত্মহত্যায় মর্মপীড়াগ্রস্থ কবি গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে মননশীলতার পরিমান কম, ভাবাবেগ বেশি। ড. সুকুমার সেন বলেছেন - 'চিন্তাতরঙ্গিনীর রচনারীতি ঈশ্বরচন্দ্র রঙ্গলাল ধরনের (তথ্য: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস / ৩য় খন্ড, ড. সুকুমার সেন)।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয়কাব্যে 'বীরবাহু কাব্য', একটি কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে প্রাচীন হিন্দুজাতির স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দানের জন্যই কবি গ্রন্থটি রচনা করেন, এই গ্রন্থে সামাজিক চেতনা অপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ বেশি। এখানে রঙ্গলালের মতোই হেমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। এমনকি ব্রিটিশ বিরোধি গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন নয়।

আশাকানন মানব জীবনের কর্ম, ভব, আশা - বিশ্বাস প্রভৃতি তত্ত্বপ্রধান বিষয়নিয়ে রচিত। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে - 'আশাকানন' একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। দশটি কল্পনায় বিন্যস্ত আলোচ্য কাব্যটির রচনারীতি এদেশে অভিনব। কিন্তু গ্রন্থটির আর কোনো উল্লেখযোগ্য গুনের পরিচয় নেই।

'ছায়াময়ী' মহাকবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডিয়া' গ্রন্থানুসরনে রচিত। এটি একটি রূপক কাব্য। লেখক গ্রন্থের পটভূমিকায় রেখেছেন হিন্দু পৌরানিক আদর্শকে। 'ছায়াময়ী' উৎকৃষ্ট কাব্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য নয়।

'দশমহাবিদ্যা' কাব্যে নবযুগের যুক্তিবাদ ও ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। দশমহাবিদ্যা শক্তিদেবীর যে দশটি রূপের কথা আছে তন্ত্রে, কবি দেবীর সেই দশরূপের মধ্যে আদিকাল থেকে

আরম্ভ করে শেষ করেন, যদিও তার গ্রন্থ বিকাশের ইতিহাস সূত্র সন্ধান করেছেন। শেক্সপীয়রের দুটি নাটকে অনুবাদেও কবির তেমন কৃতিত্ব কিছু নেই।

মহাকাব্য রূপে আলোচিত হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যটি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে কবি এ কাব্যটি রচনা করেন। সমগ্র কাব্যটির কাহিনী দুটি খণ্ডে এবং একাধিক সর্গে বিভক্ত। দধীচির আত্মদানে তাঁর অস্থি থেকে নির্মিত বজ্রে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গভূমি পুনরুদ্ধারের কাহিনীই 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কাহিনী অংশ। আলোচ্য কাব্যটির উল্লেখযোগ্যতার কারন –

(১) মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় নির্বাচনে মৌলিকতা এবং হিন্দু ধর্মের মূলনীতি অনুযায়ী কাব্যের মধ্যে Poetic justice অর্থাৎ ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় প্রদর্শিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – "স্বর্গোদ্ধারের জন্য নিজের আত্মদান এবং অধর্মের জন্য বৃত্রের সর্বনাশ যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।" সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী: অচলিত, ২য় খণ্ড।

(২) মহাকাব্যের পক্ষে উপযুক্ত কাহিনীর দৈর্ঘ্য ও বিশালতা, ইন্দ্র বৃত্রাসুর, ঐন্দ্রিলা, রুদ্রপীড় প্রভৃতি চরিত্র রূপায়নে কবিত্ব প্রকাশ বিদ্ধ করার যন্ত্রশালা প্রভৃতি অংশের বর্ননায় শব্দ চাতুর্য প্রশংসনীয়।

"সহস্র ধানুকী গর্জন ভয়ঙ্কর যখন –
দগ্ধ বায়ুস্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে,
ধূম বারুদ্ধ পরিপূর্ন গভীর সে দেশ,
সপ্তদীপ শিখমালা একত্রিত যেন।"

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করেছিলেন হেমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন- "হেমচন্দ্র থাকিতে রণমাতার ক্রোড় অরক্ষিত বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না," শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন- "বাঙালী যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়েছে।

(৪) হিন্দুর স্বাভাবিক প্রবনতা অনুযায়ী দেবতাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আবার মাতৃভূমি রক্ষায় ওদের দানবদের

প্রতি সহানুভূতি সকারের দ্বৈতভাব প্রদর্শনে কাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল,

অনন্তর হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনার সম্ভাব্য ক্ষতি বর্জন করে একটি খাঁটি মহাকাব্য রচনার ~~মধুসূদনের~~ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' নামক মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা চলে, বস্তুত বাহিরঙ্গের বিচারে হেমচন্দ্র যে মধুসূদন অপেক্ষাও সার্থকতা অর্জন করেছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, তার ফলে বাংলা সাহিত্যে যদি "মেঘনাদবধ" কাব্যের পরও দ্বিতীয় কোনো মহাকাব্যের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয় তবে সেই স্থানটি প্রাপ্য হেমচন্দ্র রচিত 'বৃত্রসংহার কাব্যের,'

হেমচন্দ্র সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন গীতিকবিতা রচনায়, পাশ্চাত্য গীতিকবিতায় আত্মনিষ্ঠ সুরটি উপলব্ধি করে কোনো কোনো কবিতায় তার সার্থক ব্যবহার করেছেন তিনি, একদিকে তার গীতিকবিতায় ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, অপরদিকে স্বদেশপ্রেমও তার কবিতায় উজ্জ্বল, যেমন — 'ভারত সঙ্গীত,' 'হতাশের আক্ষেপ,' বিভু, 'কি দশা হবে আমার,' 'যমুনাতটে' সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যেমন —

"বিভু কি দশা হবে আমার,
প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ হবে নাকি হে ভবেশ
জানিব না দিবা কারে বলে?" [বিভু, কি দশা হবে আমার]

তবুও বলতে হয়; প্রকৃতি, প্রেম; স্বদেশিকতা ও স্বজাতিবোধ কিংবা ব্যক্তিগত দুঃখানুভূতির প্রবলতা তাঁর কবিতায় অনুভূতির সময় নিবিড়তা সৃষ্টি করতে পারলেও তা ভাবাতিরেক বা sentiment এর সুরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, তা কখনো emotional বা আবেগময় কল্পনায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারেনি, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তী পর্যন্ত,

হেমচন্দ্রের কবিকর্মের সার্থক মূল্যায়ন করে সমালোচক সজনীকান্ত দাস বলেছেন —

“হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন; কারণ, তিনি আমাদের স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ প্রেমে যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন আর সে যুগের কোন কবি করেন নাই।” [বৃত্রসংহার কাব্য। ভূমিকা অংশ। সজনীকান্ত দাস। সাহিত্য পরিচয় সং]

‘বৃত্রসংহারে’ জাতি বৈরীর নিন্দা ও পরাধীনতার গ্লানি ~~দেশপ্রীতি~~ স্পষ্ট সংঘাত। বিশেষ করে হেমচন্দ্রের কোনো কোনো গীতিকবিতায় এই দেশপ্রীতি ও পরাধীনতার বেদনা বোধ ভাবানুভূতির প্রভাবে এ কালের পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে।